শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার

সোদরপ্রতিমেষু

এই হতভাগ্য দেশের যে ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার মহাব্রত তুমি গ্রহণ করিয়াছ তাহাদের সামান্য আনন্দ-বিধানের জন্য লিখিত আমার 'কেল্লা-ফতে' তোমাকে দিয়া ধন্য হইলাম। ইতি

ব্রজেনদা

কেল্লা-ফতে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

মূল্য আট আনা

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩১
দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৪৪

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচী
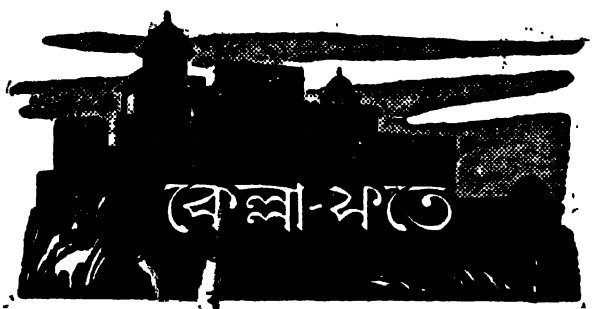
মোগল-পাঠান

তেলে আর জলে যেমন কখনও মিশ খায় না, তেমনি মোগলে আর পাঠানে বনিবনা হইবার যো ছিল না। মোগলদের আগে পাঠানরাই ছিল ভারতের মালিক। মোগল-বাদশা বাবর পাঠানদের হাত হইতে সিংহাসনটা কাড়িয়া লইয়া তাহাদের কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাবরের ছেলে হুমায়ুন বাদশা হইয়া যখন বিলাসে আর ফুর্তিতে মাতিয়া উঠিলেন, তখন বিহার অঞ্চলে শের শা নামে এক পাঠান মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। লোকটি যেমন চালাক-চতুর, তেমনি বীর। সামান্য ঘরে

জন্ম হইলেও নিজের চেষ্টাতে তিনি দেখিতে দেখিতে খুব বড় হইয়া উঠিয়াছেন। চুনারে ছিল একটা মস্তবড় মজবুত কেল্লা, এই কেল্লাটা হাত করায় তাঁহার নামটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, আর তাঁহার দুর্দ্দান্ত সেনাসামন্তেরা মোগল-বাদশার তোয়াক্কা না রাখিয়া বাংলার রাজধানী গৌড় লুঠিতে লাগিল।

খবর পাইয়া বাদশা হুমায়ুনের চটকা ভাঙিল; ভাবিলেন, পাঠানটা তো বিষম ফ্যাসাদ বাধাইল দেখিতেছি। ইহাকে আর কিছুতেই বাড়িতে দেওয়া উচিত হইতেছে না। দিলে আরও কি অনর্থ ঘটায় তাহার ঠিক কি? হুমায়ুন বাদশা আর এতটুকু সময় নষ্ট না করিয়া লোক-লস্কর কামান-বন্দুক লইয়া ছুটিলেন শের শাকে জব্দ করিতে।

শের ভাবিয়া দেখিলেন, এই অগণিত মোগল সৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করার মত বোকামি আর কিছুই হইতে পারে না। তাহাতে কেল্লাও যাইবে, দলবল-সুদ্ধ মারাও যাইতে হইবে। তাই মোগলদের বেগ দিবার জন্য চুনারের কেল্লায় কিছু লোক রাখিয়া তিনি সেখান

হইতে বাহির হইলেন—আগে কেল্লার মেয়েছেলেদের বাঁচানো দরকার। চব্বিশ-পঁচিশ ক্রোশ দূরে বরকুণ্ডায় একটা কেল্লা ছিল। শের শা চট্ করিয়া মেয়েছেলেদের চুনার-দুর্গ হইতে সরাইয়া, উপস্থিত সেই কেল্লায় লইয়া গেলেন। কিন্তু বরকুণ্ডার দুর্গটা ছোট, খুব যে মজবুত তাও নয়; তাহার উপর সেখানে এত মেয়েছেলের জায়গা হওয়াও দায়। কাজেই একটা বড়গোছের কেল্লায় তাহাদের রাখিতে না পারিলে শের শা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। বলা তো যায় না, মোগলেরা যদি চুনারের কেল্লা ফতে করিয়া এই বরকুণ্ডার দিকে ঠেল মারে,—তখন প্রাণের চেয়েও বড় যে ইজ্জৎ—মেয়েদের সেই ইজ্জৎ বাঁচানো দায় হইবে।

তখনকার দিনে রোটাসগড়ের মত জবর কেল্লা গোটা ভারতবর্ষে আর একটিও ছিল না। অনেক কাল হইতেই এই দুর্গের মালিক—হিন্দু রাজারা; কোন মুসলমান রাজাই ইহা দখল করিতে পারেন নাই। শের শা ঠাওরাইলেন, এই রোটাসগড়ের শক্ত কেল্লায় মেয়েছেলেদের রাখিতে পারিলে তবে মান বাঁচে,

মুষ্কিলেরও আসান্ হয়। তিনি তাই রোটাসগড়ের রাজার মন ভিজাইবার জন্য খুব দামী দামী ভেট পাঠাইলেন, আর নিজের বিপদের কথা জানাইয়া কেল্লার মধ্যে মেয়েদের মাথা গুঁজিবার মত ঠাঁই চাহিলেন।

চূড়ামন নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল রাজার মন্ত্রী। রাজাকে এই প্রস্তাবে রাজী করাইবার জন্য শের শা ঐ ব্রাহ্মণকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শে, আর ভেটের ঘটা দেখিয়া রাজা মেয়েছেলেদের জায়গা দিতে রাজী হইলেন। কিন্তু শের শা তাঁহার আদেশ-মত মেয়েদের সঙ্গে লইয়া যাই কেল্লার কাছাকাছি আসিয়াছেন, অমনি রাজা বাঁকিয়া বসিলেন—কাহাকেও আশ্রয় দেওয়া হইবে না। রাজার মাথায় তখন এই ভয় ঢুকিয়াছে যে, হুমায়ুন হইলেন কত ধনজন সেনাসামন্তের মালিক—ভারতের বাদশা, শের শা তাঁহার কাছে নিতান্তই হীন নগণ্য লোক। এই শেরের মেয়েছেলেদের কেল্লায় জায়গা দিলে ইচ্ছা করিয়া বাহিরের শত্রু ঘরে ডাকিয়া আনা হইবে—রাজাকে বাদশার কোপে পড়িতে হইবে।

কিন্তু শের শা তখন মেয়েছেলেদের লইয়া রাস্তায়

বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার পিছনে শত্রু। রাজার উচিত ছিল, সব দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তবে তাঁহার কথায় রাজী হওয়া। ফাঁপরে পড়িয়া শের শা রাজার উপর যা চটিয়া গেলেন, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলেন, কোন রকমে একবার বাগে আনিতে পারিলে ইহার প্রতিফলটা তিনি খুব ভাল রকমেই দিবেন। কিন্তু চতুর শের শা মনের কথা বাহিরে কিছুই প্রকাশ না করিয়া রাজাকে খুব অনুনয়-বিনয় করিয়া এক চিঠি লিখিলেন। মন্ত্রী চূড়ামন কেমন লোক, তাহা তিনি আগেই টের পাইয়াছিলেন ; এবার আরও বেশী করিয়া দিলেন তাঁহাকে ঘুষ—একেবারে ছয় মণ সোনা। আর জানাইলেন—'যেমন করিয়া পারেন, রাজাকে চটুপট পটাইয়া-সটাইয়া অন্ততঃ দিনকতকের জন্য মেয়েদের কেল্লায় রাখিবার ব্যবস্থা করুন।'

লোভী ব্রাহ্মণ একেবারে ছয় মণ সোনা পাইয়া তো আনন্দে আটখানা। তিনি রাজাকে জিদের উপর জিদ করিতে লাগিলেন—'শের শার মেয়েদের দুর্গে থাকবার জায়গা দিতেই হবে। না দিলে ভাল হবে না। বাদশা

আজ বিহারে আছেন, কাল হয়তো শেরের সঙ্গে ভাব ক'রে এখান থেকে সরে পড়বেন, তখন? তখন কি শের এর শোধ না নিয়ে ছাড়বে—মনে করেছেন?'

চূড়ামন যতই বুঝান, রাজা ততই অবুঝ হইয়া ঘাড় নাড়েন—কিছুতেই রাজী হন না। বেগতিক দেখিয়া মন্ত্রী চূড়ামন তখন শক্ত হইয়া বলিলেন—'নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়াই রাজার ধর্ম্ম। আপনি রাজা, আমি মন্ত্রী। আপনার হয়ে আমি শের শার মেয়েছেলেদের আশ্রয় দেব ব'লে কথা দিয়েছি। মানুষের মুখের কথাই হচ্ছে সব। সেই কথাই যদি গেল, তা হ'লে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? না না, আমার কথার খেলাপ কিছুতেই হ'তে পারবে না, আমি আত্মহত্যা করব —আর দেরি নয়, এখনি আমি আত্মঘাতী হ'তে চাই। মরুন আপনি ব্রহ্মহত্যার পাপে নরককুণ্ডে প'চে।'— বলিয়া চূড়ামন তখনি আত্মঘাতী হইবার জন্য যেন খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

রাজা কি আর করেন? হাজার হোক চূড়ামন হইলেন রাজ্যের মন্ত্রী—সব কাজে তাঁহার ডান হাত।

তার পর আবার জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাকে কি তিনি আত্মঘাতী হইতে দিতে পারেন? মন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া হুকুম দিলেন—'আচ্ছা, আসুক শের শার মেয়েছেলেরা আমার কেল্লায়—আমি তাদের আশ্রয় দিলুম।'

শের শা খবর শুনিয়া তো খুব খুশী। মনে মনে বলিলেন—'এইবার দেখা যাবে দুর্গে কে কাকে আশ্রয় দেয়! এখানকার রাজাও যেমন রাজা-নামের কলঙ্ক, তার মন্ত্রীও তাই। রাজাটা হচ্ছে মহা খামখেয়ালী, কথা দিয়ে কথা রাখে না। আর মন্ত্রী হচ্ছে ঘুষখোর—পয়সার গোলাম—পয়সার জন্যে না করতে পারে এমন কাজ দুনিয়ায় নেই। এ দু-জনকেই দুর্গ থেকে সরিয়ে এখানে গ্যাঁট হয়ে বসতে হচ্ছে।'

মনের ভাব মনে চাপিয়া শের শা রাজাকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। তার পর এক এক করিয়া রোটাসগড়ে ডুলি পাঠাইতে লাগিলেন। ডুলির পর ডুলি, তার পর ডুলি—বার-শ ডুলি সারবন্দী হইয়া চলিল রাজার কেল্লায়।

শের শা কি করিয়াছেন জান? গোটাকয়েক ডুলির মধ্যে জনকয়েক বুড়ীকে পুরিয়াছেন। আর বাকী সব-গুলোতে পূরিয়াছেন—লড়াইওয়ালা ভাল ভাল পাঠান যোদ্ধা। এক একটা ডুলিতে দুই দুইজন পাঠান। কিন্তু মজা এই, তাহাদের দাড়ি-গোঁপ কামানো, মুখে মেয়েদের মত ঘোমটা—দেখিতে একেবারে হুবহু মেয়েছেলে। ডুলির ভিতর অস্ত্রশস্ত্রও লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। সবার আগে চলিল সেই ডুলি কয়টা—যাহাতে ছিল সত্যিকার বুড়ীরা। ডুলি কেল্লার ফটকের কাছে পৌঁছিতেই, সান্ত্রী-পাহারা হাঁকিল—'ডুলির ভেতর কি আছে আগে দেখাও, তার পর কেল্লায় ঢোকো।'

সান্ত্রী তখন একটির পর একটি করিয়া ডুলি পরীক্ষা করিতে সুরু করিল।

শের শা দেখিলেন, তাই তো সান্ত্রী ব্যাটা যদি এমনি করিয়া একে একে সব ডুলি দেখিতে চায়, তবেই তো গোল! সব মতলবই যে ফাঁসিয়া যাইবে। তিনি ডুলি পাঠানো বন্ধ করিয়া রাজাকে লিখিলেন—'মুসলমানের মেয়েছেলেকে কারও সামনে বেরুতে নেই, এ কথা নিশ্চয়ই

একে একে বার-শ ডুলি রোটাসগড়ে চলিল

আপনি জানেন। কিন্তু কি লজ্জা, কি অপমানের কথা, একজন ভুট্টাখেগো খোট্টা কিনা ডুলি পরীক্ষা করে— জানানাদের মুখ দেখে! আপনি এখনি এর প্রতিকার করুন; না করলে, আর আমি মেয়েদের কেল্লায় পাঠাব না।'

রাজা ভাবিলেন, কাজটা সত্যসত্যই ভাল হয় নাই। তিনি তখনই সান্ত্রী-পাহারাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন— 'খবরদার, আর যেন ডুলির কাপড় খুলে দেখা না হয়।'

শের শা তো এই সুযোগই এতক্ষণ খুঁজিতেছিলেন। তিনি একে একে বার-শ ডুলি রোটাসগড়ে পাঠাইলেন। তার পর আর যায় কোথা! কেল্লায় ঢুকিয়াই গোঁপদাড়ি-কামানো যোদ্ধারা মেয়েছেলেদের সাজপোষাক ছাড়িয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যে যার ডুলি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দুর্গের ভিতর মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল।

শের শাও কেল্লার বাইরে লোকজন লইয়া লুকাইয়া-ছিলেন, তিনি সুযোগ বুঝিয়া হুড়মুড় করিয়া কেল্লায় ঢুকিয়া পড়িলেন। তার পর মার মার! কাট কাট! ধর ধর! দুর্গের লোকজনের কতক মরিল, কতক

পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। রাজা বেগতিক দেখিয়া খিড়কির দরজা দিয়া দিলেন চম্পট! শের শা খুব সহজেই তখন রোটাসগড় ফতে করিলেন।

এদিকে চুনার-দুর্গ দখল করিয়া, মোগলদের বাদশা হুমায়ূন দেখিলেন, শের শার মত দুর্দ্দান্ত লোককে জব্দ করা সহজ কথা নয়। চুনার-দুর্গ তাহার গিয়াছে বটে, কিন্তু সেই ফাঁকে সে তাহার চেয়েও বড় যে রোটাসগড়, সেটা দখল করিয়া বসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার লোকজন ওদিকে বাংলার ধনরত্নও লুঠিয়া লইতেছে। বাদশা ঠিক করিলেন, আগে শের শার লোকজনের উৎপাত হইতে সোনার বাংলাকে বাঁচাই, তাহার পর ধূর্ত্ত শেরের সঙ্গে বুঝাপড়া। কিন্তু তিনি বাংলায় গিয়া দেখিলেন, সেখানকার অগণ্তি ধনদৌলৎ শেরের লোকেরা লুঠিয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে। ফিরিবার পথেও তিনি শেরের কিছু করিতে পারিলেন না; শেরকে জব্দ করিতে গিয়া তাঁহার হাতে এমনি জব্দ হইলেন যে কোন রকমে প্রাণটা বাঁচিল।

শের শার সঙ্গে মোগলেরা আর কিছুতেই আঁটিয়া

উঠিতে পারে নাই। মোগলদের পরাস্ত করিয়া শের আগ্রার বাদশাহী সিংহাসনে বসিয়া এদেশে আর একবার

চুনার-দুর্গ

পাঠান-শাসন চালাইয়াছিলেন। সে অনেক কথা, তাহা লিখিলে একখানা মোটা বই হয়। শের শার জীবনের সেই সব আশ্চর্য্য কথা তোমরা বড় হইলে জানিতে পারিবে।

শের শার চালাকি

মোগলদের বাদশা হুমায়ূনকে দেশছাড়া করিয়া পাঠানদের সর্দ্দার শের শা দিল্লীর সিংহাসনে গ্যাঁট হইয়া বসিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে তাঁহার সুখ নাই। তাঁহারই রাজধানী দিল্লীর পঁচিশ ক্রোশ দূরে রাজা মালদেবের মস্তবড় রাজ্য। সে রাজ্যে পৎ পৎ করিয়া উড়ে স্বাধীনতার নিশান! তাহার উপর মালদেব তাঁহাকে সুচক্ষে দেখিতে পারেন না—সুবিধা পাইলেই শত্রুতা করেন। দিল্লীশ্বর হইয়া শের শার কি তাহা বরদাস্ত হয়? শের শা ভাবিলেন, মাড়োয়ার দখল করিতে না পারিলে কিসের তিনি দিল্লীশ্বর? অগণ্তি সেনাসামন্ত, গুলিগোলা, হাতীঘোড়া, রসদ লইয়া চলিলেন—মালদেবের মাড়োয়ার রাজ্যটা দখল করিতে।

শের শার চালাকি

মালদেবের রাজ্যে মাথা গলানো বড় শক্ত। সে রাজ্যের চারি দিকেই মজবুত কেল্লা। তবে একটা দিকে তেমন বেশী কেল্লা নাই। কিন্তু সেদিক দিয়া যাওয়া ভারি শক্ত। হোক শক্ত, শের শা মরুভূমির তপ্ত বালি ঠেলিয়া, এখানটা সেখানটা দখল করিতে করিতে শেষে মের্‌তায় গিয়া হাজির। এই মের্‌তা ছাড়াইতে পারিলেই মাড়োয়ার রাজ্যে ঢোকা সহজ। কিন্তু সেখানে গিয়া শের শা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তো তাঁহার আক্কেল গুড়ুম! সারি সারি রাজপুতদের তাঁবু। মালদেবের সৈন্যেরা গিস্‌গিস্ করিতেছে। অনেকে ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া আছে। ঢিলটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়।

শের শা রাজপুত জাতিকে চিনিতেন। মালব-দখলের সময় তিনি রাজপুতের অস্ত্রের ধার ভাল রকমই পরখ করিয়াছেন। তাহারা যোদ্ধার জাত—যুদ্ধের নাম শুনিলেই বুকটা তাহাদের আনন্দে ফুলিয়া উঠে। সাহস, গায়ের জোর, আর কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতায় রাজপুত-ঘোড়সওয়ারের কাছে মোগল-পাঠান কেউ কিছুই নয়। সেই রাজপুত-জাতের পঞ্চাশ হাজার ঘোড়সওয়ার

যুদ্ধের জন্য খাড়া। শের শা তো আর বোকা লোক নন। তিনি দেখিলেন—শত্রু সজাগ, তা ছাড়া দলেও ভারি; এ অবস্থায় উপরচড়া হইয়া লড়িতে যাওয়া বোকামি। তবে তাঁহার সুবিধা হয়, যদি রাজপুতেরা নিজেদের কোট হইতে বাহির হইয়া আসিয়া লড়াই করে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তবুও রাজপুতদের কোন

সারি সারি রাজপুতদের তাঁবু

গরজ দেখা গেল না। শের শা পড়িলেন মহা মুস্কিলে। এই মরুভূমির দেশে সৈন্যদের আহার মেলা ভার। এখানে মেলে অতি কষ্টে গমের মত এক রকম জিনিষ—নাম বাজ্‌রা, তাহা দিয়া রুটি করা যায়। কাজেই বেশী দিন এই মরুভূমির দেশে থাকিতে হইলে, দিল্লী বা আর কোথাও হইতে রসদ না আনাইলে চলে না। কিন্তু

যুদ্ধ করিতে আসিয়া ফিরিয়া যাওয়াও তাঁহার মত লোকের পক্ষে বড় লজ্জা, বড় অপমানের কথা। এমন অবস্থায় কি করা যায়!—বসিয়া বসিয়া শের শা মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। যেখানে গায়ের জোরে সুবিধা করা যায় না, সেখানে মুসলমান বীরেরা অনেক সময় বুদ্ধির জোরেই কেল্লা ফতে করিয়া থাকেন। মাসখানেক বসিয়া থাকিবার পর শের শা তাই মনে মনে বলিলেন—'বটে, ভেবেছ আমার ধনুকে শুধু একটা ছিলে? না বন্ধু, তা নয়। লড়াই না করেও যাতে তোমাকে আমি ঘায়েল করতে পারি তার ব্যবস্থা করছি!'

শের শা তাহার পর কি করিলেন জান? খস্‌খস্‌ করিয়া কি একখানা চিঠি লিখিলেন। এই চিঠিখানা একজন বিশ্বাসী লোককে দিয়া এমন জায়গায় ফেলিয়া রাখা হইল যেন মালদেবের মন্ত্রী তাঁবুতে ফিরিবার সময় উহা দেখিতে পান।

মন্ত্রী-মশাই পথে সেই চিঠি কুড়াইয়া পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, তাহার পর খুব গোপনে লইয়া গিয়া দিলেন রাজার হাতে।

হাতের কাছে শিকার জুটিলে শিকারীর পক্ষে যেমন হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব, বাড়ীর কাছে শত্রুর ঘাঁটি দেখিয়াও যুদ্ধ না করিয়া থাকা রাজপুত বীরদের তেমনি অসহ্য হইয়াছিল। তাঁহারা এই কারণে রাজাকে তাঁহাদের মনের কথাটা খুলিয়া বলিবার জন্য একদিন সন্ধ্যার পর রাজসভায় গিয়া হাজির হইলেন; কিন্তু দেখেন, রাজার মুখে কথা নাই, তিনি বড় বেজার, বড় গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন। বীরেরা রাজাকে তাতাইবার জন্য যুদ্ধের কথা পাড়িলেন, শত্রুর যুদ্ধের সাধ কেমন করিয়া মিটাইবেন, তাহার কথা বলিলেন। কিন্তু রাজার মুখে এতটুকু উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল না। তাঁহারা অবাক হইয়া কারণ জানিতে চাহিলেন।

রাজা কথা কহিলেন না, একটু শুক্‌নো হাসি হাসিয়া একখানা চিঠি সভার মাঝে ফেলিয়া দিলেন। একজন রাজপুত সর্দ্দার—নাম তাঁহার কুম্ভ, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে রাগে তাঁহার চোখের ভুরু কুঁচকিয়া যাইতে লাগিল। শের শা মালদেবকে ঠকাইবার জন্য যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এ

রাজপুত ঘোড়সওয়ার

সেই চিঠি। চিঠিতে মালদেবের সর্দ্দাররা যেন শের শাকে লিখিয়াছেন—'আমরা কেউ রাজা মালদেবের উপর খুশী নই। খুশী না হইবার অনেক কারণ। আপনি যদি আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন—খুশী করিবেন বলিয়া কথা দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার মিত্র না হইয়া শত্রু হইব, আর যুদ্ধ বাধিলেই মালদেবকে ধরিয়া আপনার হাতে সঁপিয়া দিব। আপনি তাঁহাকে যেমন খুশী সাজা দিবেন।'—এই চিঠিখানা পাইবার পর শের শা যেন সর্দ্দারদের কথায় রাজী আছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়া নামের সহি দিয়াছেন।

চিঠিখানা পড়া হইলে মালদেবের সর্দ্দাররা কত দিব্যি গালিয়া রাজাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, এ চিঠি তাঁহারা কেহই শের শাকে লেখেন নাই—এমন নিমকহারামি তাঁহারা কখনই করিতে পারেন না। নিশ্চয়ই এটা ধূর্ত্ত শের শার কারচুপি!

কিন্তু ইহাতে ফল হইল ঠিক উল্টা। মালদেব ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইহা সর্দ্দারদের কাজ—এখন ধরা পড়িয়া সাফাই গাহিতেছে। এই জন্তই বুঝি সর্দ্দাররা

শের শার সঙ্গে তাড়াতাড়ি লড়াই করিবার জন্য এত ব্যস্ত! রাজা তাহাদের ধিক্কার দিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সর্দ্দারদের মধ্যে কুম্ভ—যিনি চিঠিখানা সকলকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বলিলেন—'শের শার চাতুরীতে মহারাজ আমাদের অবিশ্বাস করলেন, এর চেয়ে দুঃখের কথা আমাদের আর কিছুই নেই। এ অবিশ্বাস যদি আমরা দূর করতে না পারি, তবে বৃথাই আমাদের বেঁচে থাকা, বৃথাই আমাদের জাতির গৌরব। এস, আমরা শত্রুর সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে তার চাতুরীর উপযুক্ত প্রতিফল দিই। শত্রুর বুকের রক্তের ধারায় রাজার মনের অবিশ্বাসের ছাপ ধুয়ে ফেলি।' সর্দ্দারগণ সকলেই উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া কুম্ভের কথায় সায় দিলেন।

কিন্তু রাজা শের শার চালাকিতে ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইল না। নি গভীর রাত্রে চুপি চুপি যোধপুরের দিকে চোরের ম সরিয়া পড়িলেন।

পরের দিন পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বারো হাজার

শের শার চালাকি

রাজপুত-ঘোড়সওয়ার ঝড়ের বেগে শের শার তাঁবুর উপর গিয়া পড়িল। আজ তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে,— হয় মরিবে, নয় শত্রুকে শিক্ষা দিবে। তাহাদের আক্রমণের তোড়ে শের শার ছাউনি লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সৈন্যেরা কে কোন্‌দিকে ছুটিয়া পলাইবে ভাবিয়া পাইল না। আর খানিকটা এইভাবে যুদ্ধ চলিলে শের শার পক্ষে তাল সামলানো দায় হইয়া উঠিত। কিন্তু রাজ-পুতেরা একটা বড় ভুল করিয়া বসিল, তাহারা সকলে ঘোড়া হইতে নামিয়া বর্শা-হাতে শত্রুকে তাড়া করিল।

শের শার কড়া হুকুম ছিল, তাঁহার সৈন্যেরা যেন ঢাল-তলোয়ার লইয়া রাজপুতদের সঙ্গে লড়িতে না যায়। গেলে আর তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। শের শা সুবিধা পাইয়া এইবার হুকুম দিলেন—'চালাও হাতী রাজপুতদের ওপর দিয়ে। পিষে ফেলো দুষমনদের হাতীর পায়ের তলায়।'

তখন কিল্‌কিল্ করিয়া শের শার হাতী বাহির হইয়া রাজপুত-বীরদের উপর গিয়া পড়িল। হাতীর পিছন হইতে শেরের গোলন্দাজেরা অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল,

তীরন্দাজেরা তাক করিয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু সেদিন রাজপুতদের পণ ছিল, হয় মৃত্যু, না হয় শত্রুনাশ; সম্মুখে মৃত্যু দেখিয়াও তাহাদের কেহ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল না। আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখাইয়া, অগণ্তি শত্রু বধ করিয়া, একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা দেহ রাখিল।

এই যুদ্ধে যে শের শার জয় হইয়াছিল, তাহা সত্য; আর তিনি যে রাঠোর-রাজপুতদের হাত হইতে মাড়োয়ার কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাও মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার এত সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, তাঁহাকে এত বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল যে মাড়োয়ারের যুদ্ধের কথা তিনি খুব ভয়ে ভয়ে স্মরণ করিতেন, আর মুখেও বলিতেন —'ওঃ, ঠিকে আমার কি ভুলই হইয়াছিল! এক মুঠো বাজ্‌রার লোভে আমি হিন্দুস্থানের অত-বড় রাজ্যটা খোয়াইতে বসিয়াছিলাম!'

গরীবের মা-বাপ

এখন আমরা ইংরেজ-আমলে বাস করি। কিন্তু ইংরেজের আগে ভারতের মালিক ছিলেন মোগল-বাদশারা। মোগল-বাদশারা এক-আধ বছর নয়, আড়াই-শ তিন-শ বছর এদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

এই মোগল-বাদশাদের মধ্যে শাজাহান ছিলেন ভারি অমায়িক লোক। ফুলের সুবাস যেমন চারিদিক আমোদিত করে, তাঁহার নামযশও তেমনি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের লইয়া রাজার রাজ্য, সেই প্রজাদের তিনি ছিলেন একেবারে মা-বাপ। রাজা-বাদশার কাছে গরীব প্রজার নালিশ করিবার কিছু থাকিলে, আগে সরকারী লোকজন চাকর-বাকরদের ঘুষঘাষ বা

ভেট দিয়া খুশী করিতে হইত। না করিলে অনেক সময় প্রজার আরজি রাজার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছাইত না। কিন্তু বাদশা শাজাহানের আমলে প্রজাদের তেমন কোন অসুবিধা ছিল না।

বাদশা থাকিতেন আগ্রার প্রকাণ্ড কেল্লার মধ্যে। কেল্লার পূর্ব্ব দিকে যমুনা নদীর তীর। ঐ দিকের দেওয়ালে ছিল একটা ঝরোকা। বাদশা রোজ সকাল-বেলা সেই ঝরোকায় গিয়া হাজির হইতেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য, আর তাঁহার কাছে নালিশ করিবার জন্য সেই সময় যমুনার তীরে অনেক প্রজার জমায়েৎ হইত। বাদশার ঝরোকা হইতে তখন প্রজাদের কাছে একটা লম্বা সুতা ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। প্রজাদের মধ্যে যাহাদের নালিশ করিবার থাকিত, তাহারা নিজের আরজি সেই সুতায় লটকাইয়া দিত, আরজি একেবারে ঝরোকায় খোদ বাদশার হাতে গিয়া পড়িত। এই রকম ব্যবস্থায় গরীব প্রজাদের ভারি সুবিধা হইত। তাহারা মামলা-মোকদ্দমার খরচ-খরচা হইতে রেহাই পাইত। বাদশা নিজেই তাহাদের নালিশের সুবিচার করিয়া দিতেন।

গরীবের মা-বাপ

শাজাহান বাদশার প্রাণটি ছিল ভারি নরম—সে প্রাণ প্রজার দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিলে গলিয়া যাইত। তিনি গরীব-দুঃখী, পুত্রহীনা বিধবা বা বিদ্বান্ পণ্ডিতদের ভরণ-পোষণের সুবিধার জন্য লাখরাজ জমি দান করিতেন। লাখরাজ জমির একটা মস্ত সুবিধা এই, সে জমিতে বাস করিলে রাজাকে একটি পয়সাও খাজনা দিতে হয় না। প্রজার উপর শাজাহান বাদশার দরদ ছিল কতটা, তার একটা গল্প বলি শোন।

একদিন রাত্রি অনেক হইয়াছে, তবুও বাদশা রাত জাগিয়া রাজ্যের খাজানাপত্রের হিসাব দেখিতেছেন। হিসাবপত্র উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ একখানা কাগজে তাঁহার নজর পড়িল; দেখিলেন, একটা মহালের খাজনা আগের বছর অপেক্ষা সেবার হাজার-কয়েক টাকা বাড়িয়াছে। হঠাৎ এই আয় বাড়িল কেমন করিয়া, বাদশা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনের ধোঁকা মিটাইবার জন্য তখনি দেওয়ান সাদুল্লা খাঁকে তলব করিলেন।

দেওয়ান সাহেব তখন তোষাখানার মধ্যে;—হাতে কাগজপত্র। রাত জাগিয়া হিসাবপত্র ঠিক করিতে হওয়ায়

ঘুমে তাঁহার চোখদুটি জড়াইয়া আসিতেছিল। এমন সময় দূত আসিয়া বাদশার হুকুম জানাইল।

বাদশার তলব, তার পর এত রাত্রে, নিশ্চয়ই কোন জরুরি কাজ আছে। দেওয়ান তো তখনি শশব্যস্তে ছুটিলেন দেখা করিতে। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার আগেই দূত ফিরিয়া গিয়া বাদশাকে জানাইয়া দিল যে, দেওয়ান-সাহেব কাগজপত্র হাতে লইয়া ঢুলিতেছিলেন।

এদিকে দেওয়ানও আসিয়া হাজির। বাদশা তাঁহাকে দেখিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'মন্ত্রী, আমার জানা ছিল, তুমি সজাগ হয়ে রাজ্যের শাসন চালাচ্ছ,—সব কাজই নিজে দেখছ শুনছ। আর সেই বিশ্বাসেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি আমার সেই বিশ্রামটুকু তুমিই ভোগ করতে সুরু করেছ। কাজেই এর পর থেকে আমাকেই রাত জেগে তোমার কাজ করতে হবে।'

বাদশার কথা শুনিয়া দেওয়ানের তো মাথা হেঁট। তিনি নিজের দোষের জন্য মাপ চাহিলেন।

বাদশা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাগজপত্রে দেখছি

বাদশা শাজাহান

একটা মহালের খাজনা এ বছর অনেক বেশী ধরা হয়েছে, এর কারণ আমি জানতে চাই। আমার আমাল চাষবাস করবার মত এমন কোন জমি তো প'ড়ে ছিল না, যা চাষ করিয়ে খাজনা বাড়ানো যেতে পারে? ঐ মহালের সরকারী কর্ম্মচারীকে লিখে এখনি ব্যাপারটার তদন্ত কর।'

খোঁজখবর লইয়া দু-চার দিন পরে দেওয়ান-সাহেব বাদশাকে জানাইলেন—'হুজুর, এ বছর নদী স'রে যাওয়াতে খানিকটা জমি দেখা দিয়েছে, আর সেই নূতন জমিটার জন্যেই এ বছর মহালটার মোট খাজনা কিছু বেশী ধরা হয়েছে।'

শুনিয়া বাদশা বলিলেন—'বেশ, কিন্তু সন্ধান ক'রে দেখেছ কি, জমিটা বাস্তবিকই রাজার জমি—খাসমহাল—না কাউকে দান-করা কোন জমির এলাকাভুক্ত?'

মন্ত্রী আবার তদন্ত করিয়া, এক দিন বাদশাকে জানাইলেন—'জমিটায় রাজার দখল নেই, এটা বিধবাদের দান-করা লাখরাজী জমিরই এলাকায়। এত দিন নদীর ভেতরে সেটা ছিল, এখন নদী শুকিয়ে যাওয়ায় ফের দেখা দিয়েছে।'

বাদশা বলিয়া উঠিলেন—'বুঝেছি, বুঝেছি, কেন নদী শুকিয়ে গেছে! সংসারে আপনার বলতে যাদের কেউ নেই, লাখরাজভোগী সেই সব পতি-পুত্রহীনা মেয়েছেলের চোখের জলে নদী শুকিয়ে গেছে। এ জমিতে আমার স্বত্ব নেই—এ জমি তাদের। তাদের জমি কেড়ে নেওয়া মানে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া—ঐ অসহায় বিধবাদের সর্ব্বনাশ করা।'—এই বলিয়া বাদশা একটু থামিলেন, তার পর একটু উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—'যে মহালের জমি নিয়ে এই গোল, সেই মহালের সরকারী কর্ম্মচারীটাই যত নষ্টের মূল, সে একটি আস্ত শয়তান; তাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারলেই ঠিক হ'ত, কিন্তু তাকে প্রাণে মারতে চাই নে। এখনি তাকে আমার চাকরি থেকে বরখাস্ত কর। রাজ্যে এ রকম কর্ম্মচারী থাকলে রাজারই বদনাম হবে। শয়তানের সাজার বহর দেখলে কেউ কখনও আর কারও ন্যায্য স্বত্বের ওপর হাত দিতে ভরসা করবে না। আর শোন, ঐ জমিটার দরুন এ যাবৎ যত টাকা খাজনা উশুল হয়েছে, এখনি সরকারী তবিল থেকে কড়ায় গণ্ডায় সেই

শাজাহান বাদশার দরবার

টাকা মিটিয়ে দাও—জমির মালিক সেই বিধবাদের। আর তাদের ব'লে দাও, এ জমির মালিক বাদশা শাজাহান নয়, মালিক তারাই।'

—গল্পটা শুনিয়া এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিলে, প্রজার উপর বাদশা সাজাহানের দরদ ছিল কতটা। প্রজারা তাঁহার আমলে যে কি সুখেই ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লোকে তাই তাহাদের গুণের বাদশার নামে ফার্সীতে একটা ছড়া রচনা করিয়াছিল। ছড়াটার মানে এই—

'বাদশা—মোদের গুণের বাদশা! তুমি তোমার প্রজাদের সমস্ত বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া তাহাদের ভার লঘু করিয়া দিয়াছ। তোমার আমলে অবিচার অত্যাচার বলিয়া কোন কিছু নাই, কারণ তুমি যে তোমার চোখ হইতে আরামের ঘুমটুকুও দূর করিয়া দিয়াছ।'

বুদ্ধির বহর

মোগলের বাদশা আওরংজীবের মত চালাক-চতুর লোক, আর বীরপুরুষ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যুদ্ধ বিদ্যাটাও যেমন ভাল জানিতেন, বুদ্ধির খেলাটাও তেমনি ভাল খেলিতে পারিতেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্থান বলিয়া যে একটা পাহাড়ে দেশ আছে, তাহার অনেকটা তখন তাঁহার দখলে ছিল। তাঁহার বুদ্ধি আর বিক্রম দেখিয়া নানান দেশের নানান লড়াইওয়ালা-জাতের তাক লাগিলেও এই আফগানরা কিন্তু মোটেই ভয় খাইত না। গায়ে তাহাদের অসুরের মত জোর, ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা। সমস্ত ধরাটাকেই তাহারা সরার মত ছোট মনে করে, বাদশা আওরংজীবের আর তাহারা কি

বাদশা হুমায়ুন

শের শা

পাঠান সর্দারদের বৈঠক

তোয়াক্কা রাখিবে বল? আফগানিস্থান বশে রাখিবার জন্য বাদশা যাহাদের সেখানে রাখিয়াছিলেন, এই আফগানরা একটু জুৎ পাইলেই তাহাদের নাকালের একশেষ করিয়া ছাড়িত।

দেশটা একটু হাতের কাছে থাকিলে বাদশা তাহাদের এই আস্পর্দ্ধার শাস্তিটা অবশ্য হাতে হাতেই চুকাইয়া দিতেন। কিন্তু দেশটা একটু দূরে, তাহার উপর আবার পাহাড়েও বটে; তাই তিনি নিজে আর কষ্ট স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমীর খাঁকে আফগানিস্থানের সুবাদার, কিনা লাটসাহেব, করিয়া পাঠাইলেন। লোকটা কতকটা তাঁহারই ধাতের—যেমন লড়ায়ে পটু, তেমনি চালাকিতেও মজবুত। ইহার আগেও দুই-তিনবার তিনি পাহাড়-পর্ব্বতে আফগানদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদের একহাত দেখাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, কোনবারই তাঁহার হার হয় নাই। বাদশা তাঁহাকে আফগানিস্থানে পাঠাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আক্‌মল খাঁ নামে একটা লোক তখন পাহাড়ে

আফগানদের রাজা বলিয়া নাম জাহির করিয়াছেন, আর স্বাধীন রাজার মত নিজের নামে টাকা-পয়সা চালাইতেছেন। তিনি আওরংজীব বাদশার কোন ধারই ধারিতে চাহেন না। স্বাধীনতার নামে দেশের বহু লোক তাঁহার পাশে জড় হইয়াছে।

বাদশার এই অপমান আমীর খাঁর আর বরদাস্ত হইল না। তিনি কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে নামিলেন, প্রাণপণ করিয়া শত্রুর নাশ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সব বৃথা হইল। পাহাড়ে শত্রুদের শরীর যেন পাথরের মত শক্ত, তাহারা সব একজোট হইয়া যুদ্ধে নামিলে কি আর তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবার জো আছে? লড়াইয়ে সেবার আমীর খাঁর হার হইল। হউক হার—আমীর খাঁ তবু পিছপাও হইবার পাত্র নন। তিনি ঘরে ফিরিয়া মনে মনে ফন্দি আঁটিতে লাগিলেন। তলোয়ারে তো হার হইল, কিন্তু ঘটে তাঁহার যে বুদ্ধি আছে, সে যে তলোয়ারের চেয়েও ধারাল! আমীর খাঁ ভাবিলেন, বুদ্ধিতে যদি ব্যাটাদের হার মানাইতে না পারি, তবে বৃথাই আমি বাদশার সাগরেদ।

আমীর খাঁ পরাজয়ের অপমান ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আফগানদের সঙ্গে ভাব করিবার ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন। আফগানরা সভ্যতা-ভব্যতার ধার বড়-একটা ধারে না—কাহারও সঙ্গে সহজে মেলামেশা করিতে নারাজ। কিন্তু খাঁ-সাহেব তাহাদের সঙ্গে এমনি আপনজনের মত ব্যবহার স্থুরু করিয়া দিলেন যে শেষে তাহারা তাঁহার সঙ্গে না মিশিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার পর কিছুদিনের মধ্যেই সাপুড়ের হাতের সাপের মত আফগানরা আমীর খাঁর বাধ্য হইয়া উঠিল—দলে দলে আমীর খাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে লাগিল। আমীর খাঁ যে আওরংজীব বাদশার লোক—পরম শত্রু, সে কথা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাকে পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া জানিল।

আফগানদের দলপতি আকমল খাঁও আবার তেমনি সেয়ানা। আওরংজীব বাদশার লোক দেশের মধ্যে এখনও বেশ চুপচাপ বসিয়া আছে—হার মানিয়াও পলাইয়া যায় নাই! আবার দেশের লোকদের হাত করিতে চায়। মতলব তো ভাল নয়; এ লোককে

দেশ-ছাড়া করিতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না।

পাহাড়ে পাহাড়ে আফগানদের নানা গোষ্ঠী, নানা ঘর। ঝট্‌পট্‌ আসিয়া আক্‌মল খাঁর সঙ্গে জুটিবার জন্য তাহাদের সকলের তলব হইল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর লড়াইয়ের নামে আফগানরা জোয়ারের জলের মত নাচিয়া ফুলিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে ঢাল-তলোয়ার, বন্দুক-বর্শা লইয়া যোদ্ধারা সব ছুটিয়া চলিল।

সুবাদার আমীর খাঁ দেখিলেন গতিক বড় মন্দ। আফগানরা যে ক্রমেই দলে ভারি হইতেছে। একবার তো যুদ্ধ করিয়া হার হইয়াছে; লোকজনও বড় কম সাবাড় হয় নাই। আবার যদি জোট বাঁধিয়া ব্যাটারা হুড়মুড় করিয়া ঘাড়ের উপর পড়ে, তাহা হইলে কি হইবে কে জানে! আমীর খাঁর এক জন খুব হুশিয়ার চালাক কর্ম্মচারী ছিল; নাম তাহার—আব্‌দুল্লা। আমীর খাঁ তাহার সঙ্গে পরামর্শ আঁটিতে বসিয়া গেলেন। অনেক পরামর্শের পর মতলব ঠিক হইলে আব্‌দুল্লা এক মজার কাণ্ড করিলেন;—তিনি আফগানদের এক এক গোষ্ঠীর

সর্দ্দারদের তাঁবুতে এক একখানা চিঠি পাঠাইলেন। সব চিঠিতেই এই কয়টি কথা লেখা ছিল ;—

"আফগানরাই এদেশের মালিক। তাদের দেশ তারাই শাসন করে, ইহাই তো আমরা চাই। খোদাকে ধন্যবাদ, আমাদের সেই আশা বুঝি বা এতদিনে ফলিল! তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। সে কথাটা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। যিনি আফগানিস্থানের রাজা, তিনি কেমন-ধারা লোক তা আমাদের জানা নাই। রাজ্য চালাইবার গুণ যদি ষোল আনা তাঁহার থাকে, তবে পত্রপাঠ আমাদের জানাইবে। আমরাও সকলে তাঁহার দলে গিয়া জুটিব ; মোগল-বাদশা আওরংজীবের চাকুরিতে আমাদের অরুচি হইয়াছে।"

চিঠি পড়িয়া আফগান-সর্দ্দারদের ফূর্ত্তি দেখে কে! বিনা যুদ্ধেই কেল্লা ফতে! শুধু তাই নয়, শত্রুপক্ষের লোক আসিয়া দল ভারি করিতে চায়। তারা তখনই উৎসাহের সঙ্গে চিঠির জবাব দিল। লিখিল—এমন গুণের রাজা আর হয় নাই, বুঝি বা আর হইবেও না।

এই চিঠি পাইয়া আবদুল্লা আবার লিখিয়া জানাইলেন

—"তোমাদের মুখে রাজার গুণের কথা শুনিয়া মনে খুব ভরসা হইল। আরও ভরসা হয়, যদি তোমরা রাজার গুণের একটা পরীক্ষা লও। যে সব জায়গা রাজা তোমাদের সাহায্যে আগেই জয় করিয়াছেন, রাজা খুব গুণী খুব যোগ্য হইলে সে সব জায়গা কখনও একলা ভোগ করিতে চাহিবেন না। তোমরা সেই সব জায়গা তোমাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দিতে বল— দেখি, তোমাদের রাজা কি করেন।"

আফগান-সর্দ্দাররা ভাবিল, কথাটা মন্দ নয়। একবার যাচাই করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? তাহারা তখন সব একমত হইয়া আকৃমলের কাছে জমির ভাগ চাহিয়া বসিল।

আকৃমলের মহা বিপদ! অল্পস্বল্প জমি দখলে আসিয়াছে। সেটুকু অতগুলি সর্দ্দারের মধ্যে কেমন করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া চলে? মাথা চুলকাইয়া বলিলেন—'সে কি ক'রে হবে?'

কি ক'রে হবে! সর্দ্দাররা রাগে একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রাণ দিয়া, দেহের রক্ত দিয়া জমি

জয় করিয়া দিবে, আর তাহা ভাগ করিয়া দিবার কথা উঠিলেই যত আপত্তি! এই তাহাদের গুণের রাজা? ইহারই জন্য তাহারা লড়াই করিতে যাইতেছিল! ভাগ্যে আবদুল্লা তাহাদের পরখ করিতে বলিয়াছিল! তাহারা তখনি যে যাহার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

আকমল বেগতিক দেখিয়া জমি ভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন সর্দ্দারদের মন ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উপর ভাগের সময় আকমল নিজের গোষ্ঠীর যে সব আফগান, তাহাদের ভাগ একটু বেশী করিয়া বাঁটিলেন। আর যায় কোথা! হিংসার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিজেদের মধ্যে তখন হাতাহাতি খুনোখুনি হইবার জোগাড়। কিছুক্ষণ রোখারুখি করিয়া শেষে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর আফগানরা আর কোনও গোল করে নাই, কাহাকেও আর নূতন রাজা বলিয়া মানে নাই। বুদ্ধির বল যে তলোয়ারের বলের চেয়েও বড়, এই ঘটনায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমীর খাঁর এই বুদ্ধির খেলায় এতদূর

কাজ হইয়াছিল যে, এক আধ বছর নয়, বাইশটি বছর তিনি নির্ব্বিবাদে কাবুল শাসন করিয়াছিলেন। আফগানদের তিনি এমনি বশ করিয়াছিলেন যে তাহারা ঘরোয়া বিবাদ মিটাইবার দরকার হইলে আগে তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিত। আমীর খাঁ তাহাদের এমন সব মতলব বাতলাইয়া দিতেন যে তাহারা নিজেরা নিজেরা কাটাকাটি করিয়া মরিত, তাহাদের কেহ আর মোগলদের কোনও রকম বেগ দিত না।

বুদ্ধির বল

আমীর খাঁকে আফগানিস্থানের শাসনকর্তা করিয়া ও-রাজ্যটার সম্বন্ধে বাদশা আওরংজীব খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন। দুর্দ্দান্ত লড়াইওয়ালা আফগানরা আমীর খাঁর হাতে যেন খেলার পুতুল বনিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে যেমন নাচাইতেন, তাহারা তেমনি নাচিত; আর তিনি মনের সুখে দেশ-শাসন করিতেন। এই জন্য বাদশা আওরংজীব যখন-তখন আমীর খাঁর বুদ্ধির তারিফ করিতেন। হঠাৎ এক দিন রাত্রে কাবুল হইতে খবর আসিল, আমীর খাঁ মারা গিয়াছেন। খবর শুনিয়া বাদশার তো একেবারে মাথায় হাত! তখনি পরামর্শের জন্য আরশাদ খাঁর ডাক পড়িল। আরশাদ খাঁ এক সময়ে আফগানিস্থানের দেওয়ান ছিলেন। বাদশা বলিলেন—

'আরশাদ, বড়ই ভাবনার কথা। আমীর খাঁ মারা গেছে, এখন উপায়? আফগানরা যে রকম অশান্ত দুর্দ্দান্ত লোক, তাতে আমীর খাঁর জায়গায় লোক পাঠাবার আগেই হয়ত তারা সেখানে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলবে!'—বলিয়া বাদশা একখানা চিঠি আরশাদ খাঁর সামনে ফেলিয়া দিলেন।

এই চিঠিতে আমীর খাঁর মৃত্যুর খবর ছিল। আরশাদ চিঠি পড়িয়া বলিলেন—'আমীর খাঁ মারা গেছেন এটা অবশ্য ভাল খবর নয়, কিন্তু তাতে ভয়ের কারণ নেই জনাব। তাঁর স্ত্রী সাহিবজী এখনও বেঁচে। জনাব কি জানেন না যে, আফগানিস্থানের সত্যিকার সুবাদার আমীর খাঁ নন, তাঁর স্ত্রী সাহিবজী?'

আরশাদ খাঁ এতটুকু মিথ্যা বলেন নাই। আমীর খাঁর স্ত্রীর মত চালাক-চতুর মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। খাঁ-সাহেব কোন রকম গোলে পড়িলেই আগে গিন্নী স্ত্রীর পরামর্শ লইতেন। সাহিবজীর মন্ত্রণার জোরেই আমীর খাঁ অনেক সময় বিপদ-আপদের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতেন। সাহিবজী বাপের উপযুক্ত বেটী। তাঁহার

বাপ আলিমর্দ্দান খাঁ এক জন মস্তবড় লোক, আওরংজীব বাদশার বাপ—বাদশা শাজাহানের দরবারের তিনি ছিলেন সব চেয়ে বড় ওমরা।

সাহিবজী একবার দিল্লী শহরের উপরেই তাঁহার উপস্থিত-বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি চৌদোলে চড়িয়া শহরের এক গলির ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় বাদশার একটা ক্ষেপা হাতী তাঁহার সামনে আসিয়া পড়ে। সাহিবজীর লোকজন হাতীটাকে ফিরাইয়া দিবার অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু হাতীর মাহুতটা ছিল ভারি বদমায়েশ; তাহার উপর আবার সে খোদ বাদশার মাহুত, কোন কিছুর তোয়াক্কা না রাখিয়া হাতীটাকে সামনের দিকে চালাইয়া দিল। আর একটু হইলেই হাতীটা চৌদোল, আর চৌদোলের বাহকসুদ্ধ সাহিবজীকে পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া মারে! বেহারাগুলো চৌদোল ফেলিয়া দে ছুট! মুসলমান মেয়েছেলেদের বাহিরের কাহাকেও মুখ দেখাইতে নাই; সাহিবজী তাই কাপড়ের উপর কাপড়, তাহার উপর কাপড় দিয়া নিজেকে বেশ

করিয়া ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে এখনি প্রাণটা যাইবে। আর কেহ হইলে অবশ্য লজ্জার খাতিরে চৌদোলের ভিতর বসিয়া বসিয়াই মরিত, কিন্তু সাহিবজী সে রকমের মেয়ে নন, তিনি চকিতে চৌদোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এক ছুটে সামনের এক পোদ্দারের দোকানে গিয়া উঠিলেন।

তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল; কিন্তু তিনি মুসলমান-সমাজের কাছে একটা ভয়ানক অন্যায় ও দুঃসাহসের কাজ করিয়াছেন। শুধু যে লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে তাহাই নয়, তিনি ভিতর হইতে বাহির হইয়া দশের চোখের সামনে পড়িয়াছেন। আমীর খাঁ স্ত্রীর উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন; এমন কি স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার একরকম ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। দিনকতক পরে কথাটা বাদশা আওরংজীবের বাপ—শাজাহানের কানে উঠে। তিনি আমীর খাঁকে ডাকিয়া বলিয়া দেন, 'সাহিবজী তো পর্দ্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে ভাল কাজই করেছে। তাতে ক'রে সে তো নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছেই—সঙ্গে সঙ্গে তোমার মানও বাঁচিয়েছে। পাগলা হাতীটা

সাঁইবজী চকিতে চৌদল হইতে লাফাইয়া পড়িলেন

যদি তাকে শুঁড়ে ক'রে জড়িয়ে ধ'রে পথের মাঝখানে ফেলে দিত, তখন কোথায় থাকতো পর্দ্দার বড়াই, আর কোথায় থাকতো তোমার মান?' আমীর খাঁ কথাটা তলাইয়া বুঝিলেন। তাই আবার স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করিলেন।

এই ঘটনার কথা যে আওরংজীব বাদশার জানা না ছিল তাহা নয়, তাহার উপর আরশাদ খাঁর মুখে সাহিবজীর প্রশংসা শুনিয়া তিনি অনেকটা ভরসা পাইলেন। তখনি সাহিবজীকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যতদিন না আমীর খাঁর জায়গায় নূতন সুবাদার পাঠানো হয়, ততদিন আফগানিস্থানের শাসনভার তাঁহারই উপর।

আমীর খাঁ হঠাৎ মারা যান। সাহিবজী যে সহজেই কাবুল শাসন করিতে পারিবেন, তাহার পরিচয় তিনি স্বামীর মৃত্যুর দিনই দিয়াছিলেন, সময়ে সে খবর বাদশার কানে আসিল। বাদশা শুনিয়া যে খুব খুশী হইয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমীর খাঁ লোকলস্কর লইয়া একটা কাজের জন্য উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় পথের মাঝে তাঁহার মৃত্যু হয়। সাহিবজী

সে সময় তাঁহার সঙ্গে। তিনি দেখিলেন মহা বিপদ উপস্থিত! আমীর খাঁর জন্যই এতকাল দাঙ্গাবাজ আফগানরা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া আছে। আজ যদি ফস্ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর খবর কোন রকমে তাহাদের কানে গিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে! আফগানরা ক্ষেপিয়া উঠিবে, আর সেই সরু পাহাড়ে-রাস্তায় তাঁহাদের আটক করিয়া হয়ত এখনি কচুকাটা করিবে—আওরংজীব বাদশার এই রাজ্যটুকু এতদিনে তাঁহার হাত হইতে খসিয়া যাইবে। সাহিবজীর আর স্বামীর জন্য শোক করা হইল না. মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া চোখের জল মুছিয়া বুদ্ধির খেলা খেলিতে বসিয়া গেলেন। চতুরা সাহিবজী একটা লোককে আমীর খাঁর মত সাজগোজ করাইয়া, পাল্কির মধ্যে বসাইয়া পথ চলিবার হুকুম দিলেন। সবাই মনে করিল, পাল্কি করিয়া আমীর খাঁ ঘরে যাইতেছে। তিনি যে মারা গিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতেই পারিল না।

আমীর খাঁর মৃত্যুর কথা তাহার পর যখন আফগান-সর্দ্দারদের কানে পৌঁছিল, সাহিবজী তখন রাজ্যের

আটঘাট বাঁধিয়া স্বামীর আসনে বসিয়াছেন। আফগানরা মাথা তুলিবার সাহস করিল না, বরং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার কাছে আত্মীয়স্বজনদের পাঠাইয়া দিল। সাহিবজী তাহাদের খুব খাতির-যত্ন করিলেন, আর বিদায় দিবার সময় তাহাদের দিয়া সর্দ্দারদের জানাইয়া দিলেন—'তোমাদের পাওনা-গণ্ডা ঠিকমত পাবে। কিন্তু খবরদার! লড়াই করতে এস না, এলে ভাল হবে না কিন্তু। আর লড়াই যদি একান্তই করতে চাও তো আর দেরি করবার দরকার নেই, এখনি অস্ত্র ধর—দেখা যাক, কে হারে, কে জেতে!'—কথা শুনিয়া সবাই মাথা নীচু করিয়া রহিল, কেহ কোন কথা কহিল না।

সাহিবজী ইহার পর দুই বৎসর আফগানিস্থান শাসন করিলেন। আফগানরা তাঁহার খুব বাধ্য ছিল। স্বামীর জায়গায় নূতন সুবাদার আসিল; সাহিবজীও ছুটি পাইলেন। কিন্তু সংসারে আর তাঁহার মন টিকিল না। সংসারের সকল সাধ তো স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে! বাদশার অনুরোধেই

কেবল এতদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজকার্য্য লইয়া পড়িয়া-ছিলেন। এইবার শেষের দিনগুলি আল্লার নাম করিয়া কাটাইবার জন্য তিনি মুসলমানের মহাতীর্থ মক্কায় যাওয়া স্থির করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি খোদার নামগান করিতে, আর দুই হাতে মনের সাধে দীনদুঃখীদের মধ্যে দান-খয়রাৎ করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে লাগিলেন।

বাদশার নেকনজর

পঞ্জাবের হসন-আব্‌দাল শহরে বাদশা আওরংজীবের একখানা মস্তবড় বাগান-বাড়ী ছিল। এই বাড়ীর বাগানের ভিতর দিয়া জল বাহির হইয়া তোড়ে নীচের একটা নালায় পড়িত। সেই নালার মুখে এক বুড়ো জাঁতাকল বসাইয়াছিল। বাগানের জল সজোরে জাঁতার উপর পড়িলেই উহা ঘুরিত, সঙ্গে সঙ্গে গম পেষাই হইয়া ময়দা বাহির হইত। সেই ময়দা বেচিয়া অতিকষ্টে কাচ্চাবাচ্চা লইয়া বুড়োর দিন গুজরান হইত।

হসন-আব্‌দাল জায়গাটা পাহাড়ে, কাজেই গ্রীষ্ম-কালেও খুব ঠাণ্ডা। রাজধানী দিল্লী খুব গরম জায়গা, আওরংজীব বাদশা তাই এ সময়ে মাঝে মাঝে সদল-বলে এখানে হাওয়া বদলাইতে আসিতেন। সে-বার বাদশা

আসার পর তাঁহার চাকরবাকরেরা, কি জানি কেন, যেখান দিয়া বাগান-বাড়ীর জল বাহির হইয়া নালায় পড়িত তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। জলও আর নালায় পড়ে না, বুড়োর ময়দার জাঁতাও আর ঘোরে না। শেষে বুড়োর পেট চলা দায়, ছেলেমেয়ে লইয়া সে বড়ই মুস্কিলে পড়িল।

বখ্‌তাওর খাঁ আওরংজীব বাদশার এক জন বড় কর্ম্মচারী। বুড়োর কষ্টের কথা এক দিন তাঁহার কানে গেল। তিনি সেই দিনই সন্ধ্যার সময় কথায় কথায় বুড়োর অবস্থা বাদশাকে জানাইলেন। আওরংজীব বাদশা নিজে গোঁড়া মুসলমান, মুসলমান প্রজাদের উপর দরদ তাঁহার সব চাইতে বেশী। যখন তিনি শুনিলেন বুড়ো ময়দাওয়ালা এক জন মুসলমান—তাঁহারই চাকর-বাকরের দোষে অনাহারে মর-মর, তাঁহার যা কষ্ট হইল সে আর কি বলিব? বাদশার মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল যে রাত্রে বিছানায় শুইয়াও তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন, তিনি তো রাজভোগ খাইয়া তোফা আরামে বিছানায় গড়াইতেছেন, সে বুড়ো বেচারীর হয়ত আজ একবেলা এক মুঠা আহারও জুটে

নাই। পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট করিয়া মরিতেছে। বাদশা আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, তখনি বিছানা ছাড়িয়া বখ্‌তাওর খাঁকে ডাকাইয়া বলিলেন—'এখনি দু-থালা ভাল ভাল খাবার, আর পাঁচটা সোনার মোহর বুড়োর বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে।'

বখ্‌তাওর খাঁ আবার বুড়োর ঠিকানা জানিতেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক পেয়াদার কাছে সন্ধান পাইলেন যে, পাহাড়ের উপরে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে বুড়ো বাস করে। একটা লোকের হাতে খাবারের থালা দিয়া বখ্‌তাওর তাঁহার সঙ্গে চলিলেন—বুড়োর উদ্দেশে! রাত্রে বুড়োর চোখেও ঘুম ছিল না। তাহার ময়দার কল বন্ধ হওয়ায় একটি পয়সাও আয় নাই। কাচ্চাবাচ্চা লইয়া ওখানে পড়িয়া থাকিলে যে অনাহারে মরিতে হইবে, তাহাও ঠিক। এ বয়সে বুড়োর আর নূতন কিছু করিবারও উপায় নাই। কি করিবে, কোথায় যাইবে— ভাবিয়া সে আর কূলকিনারা পাইতেছে না। এমন সময় বখ্‌তাওর খাঁ ও তাঁহার সঙ্গী বুড়োর বাড়ীতে গিয়া হাজির। তাঁহারা যখন সেই খাবারের থালা ও মোহরগুলি

বাদশার খয়রাৎ বলিয়া তাহার সামনে ধরিলেন, তখন বুড়ো আনন্দের বেগ সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পরের দিন বুড়োর দুয়ারে বাদশার পাল্কি আসিয়া হাজির! তাহাকে এখনি রাজবাড়ীতে যাইতে হইবে—বাদশার তলব। পাল্কির গায়ে কত রং-বেরঙের ছবি, মকরমুখো রুপার দাণ্ডিতে সোনার চোখ জ্বল্‌জ্বল করিতেছে। বুড়ো তো জীবনে এমন পাল্কি কখনও চোখে দেখে নাই—পাল্কিকে সে কুর্নিশ করিবে, না আর কিছু করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না। শেষে লোকজনদের কথায় সে পাল্কিতে চড়িয়া বসিল।

বুড়োকে দেখিয়া বাদশা খুব খুশী হইলেন, আদর করিয়া তাহার ঘর সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আছে না আছে তাহার খোঁজ লইলেন।

খোদ শাহানশা বাদশার সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে, বুড়ো কখনও মনেও করিতে পারে নাই। তাহার হাত কাঁপে, পা কাঁপে, গলা শুকাইয়া কাঠ হয়, মুখ দিয়া কিছুতেই কথা বাহির হয় না।

বাদশা তাহাকে ভরসা দিয়া ঠাণ্ডা করিলে হাত-জোড় করিয়া সে অতিকষ্টে ঘর-সংসারের হাল জানাইয়া বলিল যে, সংসারে তাহার এক স্ত্রী, দুইটি ছেলে ও দুইটি আইবুড়ো মেয়ে। বাদশা দেখিলেন, সংসারে বুড়ো একলা নয়। অনেকগুলি পোষ্য লইয়া সে বেকার হইয়া পড়িয়াছে। লজ্জিত হইয়া বলিলেন—'চাকর-বাকরদের দোষেই তোমাকে এত কষ্টে পড়তে হয়েছে। তুমি আমার প্রতিবেশী, তোমার দুঃখ দূর করাই আমার কর্ত্তব্য, তা না ক'রে আমি যে তোমার দুঃখের কারণ হয়েছি সেজন্যে আমি দুঃখিত।' বাদশা বুড়োকে নগদ দু-শ টাকা দিলেন, অন্দরের বেগমেরাও অনেক টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি, কাপড়-চোপড় দান করিলেন। দুই দিন রাজার হালে রাজবাড়ীতে কাটাইয়া, বুড়ো ঘরে ফিরিবার জন্য পাল্কিতে উঠিল। বুড়ো তখন আর সে বুড়ো নাই—একেবারে নূতন মানুষ। গায়ে তাহার শাল, কিংখাবের পায়জামা, জামায় আবার জরির কত কাজ, মাথায় বাহারে টুপি, গায়ে আতর-গোলাপের খোশবায়! ঐ বেশে সে যখন বাড়ীতে পৌছিল, তখন তাহার স্ত্রী আর

ছেলেমেয়েরা তাহাকে চিনিতেই পারে না। তাহার পর একটু ঠাহর করিয়া দেখিয়া তাহাকে যখন চিনিল, তখন আর তাহাদের আনন্দ দেখে কে!

দিন দুই তিন পরে আবার বাদশার পাল্কি বুড়ো ও তাহার মেয়েদের লইতে আসিল। পয়সার অভাবে এত দিন আইবুড়ো মেয়ে দুইটির বিবাহ হইতেছিল না। বাদশা তাহাদের বিবাহের জন্য বুড়োকে হাজার টাকা দিলেন। বেগমেরা গয়নাগাঁটি, পোষাক-আষাক, আরও কত কি দিলেন। বয়সের দরুন বুড়োর মুখের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। চোখ দুইটিও যাইবার থাখিল। বাদশা নিজের হাকিম পাঠাইয়া বুড়োর চোখের চিকিৎসা করাইলেন। আবার তাহার ছেলে দুইটিও বাদশার দেওয়া অনেক রকম দামি জুতা জামায়, জরির তাজে ক্ষুদে নবাব সাজিয়া মনের সুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুড়োর ময়দার জাঁতা আবার আগের মতই চলিতে লাগিল। বাদশা বুড়োর আরও একটা জাঁতা বসাইয়া দিলেন। জাঁতা ঘুরাইবার জন্য সরকারী বাগান হইতে আরও বেশী করিয়া জল যোগানো হইতে লাগিল।

বাদশার নেকনজর

বাদশা আওরংজীব তাঁহার চাকর-বাকরদের উপর কড়া হুকুম জারি করিলেন—এবার যদি বাগানের জলের অভাবে বুড়োর ময়দার কল চলা বন্ধ হয়, তবে তিনি কাহারও ঘাড়ে মাথা রাখিবেন না।

ওমরার উপস্থিত-বুদ্ধি
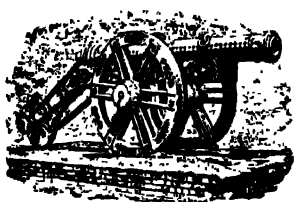
নাদির শা আগে ছিলেন সামান্য ঘরের ছেলে—ভেড়া চরাইয়া তাঁহার দিন গুজরান হইত। তিনি ভাবিতেন—আমি কি দশ জনের এব জন হইতে পারি না? চেষ্টা-যত্ন থাকিলে মানুষের বড় হইতে কতক্ষণ? নাদির ভেড়া-চরানো ছাড়িয়া পারস্যের রাজার সেনাদলে ভর্ত্তি হইলেন। অল্প দিনের ভিতরেই ভাল সৈনিক বলিয়া নাদিরের নাম খুলিয়া গেল। ক্রমে নিজের চেষ্টায় তিনি পারস্যের রাজসিংহাসন জুড়িয়া বসিলেন, কিন্তু তাহাতেও তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; আরও ধনদৌলতের জন্য তাঁহার মন ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

নাদির শা

ওমরার উপস্থিত-বুদ্ধি

দিল্লীর বাদশা তখন মহাবিলাসী মহম্মদ শা। কাজের মধ্যে তাঁহার মজা করিয়া নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমানো, আর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া নাচগান ফুর্ত্তি হরদম্। রাজ্যের আমীর-ওমরারা আর কি করেন—তাঁহারা ঘরোয়া বিবাদে থাকেন মত্ত। দেশের যখন এই দুর্দ্দশা, তখন নাদির শা ভাবিলেন—তোফা! এ সময়টা একবার বাজপাখীর মত দিল্লীর উপর হুস্ করিয়া গিয়া পড়িলে ভারি মজা হয় কিন্তু! মোগল-বাদশাদের কতকালের সঞ্চয় করা ধনদৌলৎ, মণির সেরা কোহিনূর, তাহার উপর সোনায়-গড়া মণিমুক্তাঘেরা ময়ূর-সিংহাসন—ক্রোর টাকা যাহার দাম—সবই হাত করা যাইবে। আর এই সুযোগে দেশের বোকা লোকগুলাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে যে, মোগল-বাদশার খোলসটাকেই তাহারা এত দিন ডরাইয়া আসিয়াছে—আসল বাদশা কোন্ কালে অক্কা পাইয়াছে! পালোয়ানের সাজপোষাক-পরা একটা মরা লোককে তাহারা জীয়ন্ত পালোয়ান ভাবিয়াই ভয়ে সারা।

নাদির বুক ফুলাইয়া সেনাসামন্ত কামানবন্দুক

লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—মোগল-বাদশার রাজধানী দিল্লীর দিকে, আর দেখিতে দেখিতে লাহোর পর্য্যন্ত বিনা বাধায় দখল করিয়া লইলেন। মোগলদের বাদশা মহম্মদ শার তখন চটকা ভাঙিল। তিনি ভাবিলেন, এ তো ভাল আপদ জুটিল দেখিতেছি, নাদিরকে এখনি দাবাইতে না পারিলে আর বেশী দিন আরামে নিদ্রা দেওয়া চলিবে না। দিল্লী হইতে কিছু দূরে কর্নাল নামে একটা জায়গায় নাদিরের সঙ্গে বাদশা মহম্মদ শার লড়াই বাধিল। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ নাদিরের সঙ্গে যুঝিয়া উঠা বিলাসী বাদশার কর্ম্ম নয়। গুড়ুম গুড়ুম—নাদিরের কামান ডাকিতে লাগিল, বন্ বন্ শব্দে তীরন্দাজেরা মোগল-সৈন্যের উপর তীর বৃষ্টি করিতে লাগিল। বাদশার বহু লোক মরিল। বাকী যাহারা রহিল, নাদির তাহাদের কাহারও লইলেন গর্দ্দান, কাহাকেও বা করিলেন কয়েদ। এমন কি বাদশা মহম্মদ শাকেও শেষে ঘাড় হেঁট করিয়া নাদিরের তাঁবুতে যাইতে হইল।

দিল্লীতে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল! নাদির শা—

যাহার সঙ্গে যুদ্ধে বাদশাহী ফৌজ তচ্‌নচ হইয়া গিয়াছে—সেই দুর্দ্দান্ত নাদির শা আসিতেছে! কখন কাহার কি হয়! শহরের লোকেরা তো ভয়েই কাঁটা। এমন সময় নাদির শা বাদশাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীর কেল্লার মধ্যে ঢুকিলেন।

পরের দিন নাদির শা, আর বাদশা মহম্মদ শা কেল্লার মধ্যে দরবার-ঘর—দেওয়ান-ই-খাসে—বসিয়া, দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কফি খাইবার সময় হইয়াছে। কফি দিবার ভার পড়িয়াছে—বাদশার এক জন উঁচুদরের ওমরার উপর।

ওমরা যখন সোনার থালায় কফির বাটি বসাইয়া, আস্তে আস্তে দরবার-ঘরে ঢুকিলেন, তখন ঘরের লোক-জনেরা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল—ওমরা-সাহেব করেন কি, কাহাকে আগে কফির বাটি দেন। মোগল-বাদশা হইলেন মনিব—তাঁহাকে আগে কফি দিলে অতিথির অপমান করা হইবে, আর অতিথিও বড় যে-সে অতিথি নন,—বাদশার বাদশা! আমীর-ওমরা তো দূরের কথা, খোদ বাদশাও তাঁহার নামে ডরান। সেই দুর্দ্দান্ত অতিথি

অপমান বোধ করিলে কি আর রক্ষা আছে! আবার, অতিথি নাদির শাকে আগে কফি দিলেও বিপদ—বাদশাকে খাটো করা হইবে, আর তিনি চটিয়া হয়ত তাহার গর্দ্দান লইবেন, না, কি করিবেন, কে বলিতে পারে? নাদির শা তো এদেশে রাজত্ব করিতে আসেন নাই; আসিয়াছেন ধনদৌলৎ আত্মসাৎ করিতে। কাজ গুছানো হইলেই দু-দিন পরে দিবেন চম্পট। তখন বাদশার কোপ হইতে বাঁচায় কে?

কাজটা কিন্তু যতই শক্ত হোক না কেন, যে ওমরার উপর কফি দিবার ভার পড়িয়াছিল তিনি ছিলেন খুব চালাক লোক; ঠিক করিলেন, এমন করিয়া কাজটা হাঁসিল করিব, যাহাতে 'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে!' তিনি ধীর-শান্তভাবে বাদশার কাছে গিয়া বলিলেন—'রাজার রাজা খোদ বাদশার অতিথি—আদরের মানী অতিথিকে কফির বাটি এগিয়ে দেওয়া যে বড় ভাগ্যের কথা। এত বড় কাজের যে গৌরব সেটা আপনারই পাওনা, তা থেকে তো আমি আপনাকে বঞ্চিত করতে পারি না।'

মহম্মদ শা

কথা শুনিয়া মহম্মদ শা মহাখুশী হইয়া কফির পেয়ালা ওমরার হাত হইতে নাদিরের হাতে তুলিয়া দিলেন। ওমরার উপস্থিত-বুদ্ধিতে ঘর এবং পর দুই দিকই রক্ষা পাইল। নাদির আর যাহাই হউন—গুণের কদর করিতেন। তিনি হাসিমুখে পেয়ালাটা হাতে লইয়া ওমরার দিকে লক্ষ্য করিয়া বাদশাকে বলিলেন—'ভায়া হে, তোমার আর সব কর্ম্মচারীরা যদি এই ওমরাটির মত নিজের কর্ত্তব্য পালন করতে জান্‌ত তা হ'লে—জোর ক'রে বলতে পারি—আমাকে বা আমার লালটুপিওয়ালা 'কিজিলবাশী' সৈন্যদের দিল্লীতে দেখতে পেতে না। যদি নিজের ভাল করতে চাও, এ রকম লোক যত পার বাহাল কর!'

'কেল্লা-ফতে'র লেখকের

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা

মজাদার বই

রাজা-বাদশা

রাজায় রাজায় যুদ্ধ, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, কথায় কথায়
হাসিকান্নার বন্যা, পাতায় পাতায় ছবি, চোখ-জুড়ানো
রঙীন মলাট

দাম আট আনা

শিবাজী মহারাজ

শিবাজীর অপূর্ব্ব গল্প

মূল্য বারো আনা

রণ-ডঙ্কা

মজাদার গল্প, পাতায় পাতায় ছবি, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে
রঙীন মলাট

দাম দশ আনা